ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 101-109
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.014

মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটো গল্পের আলোকে নিম্নবর্গ তথা অন্ত্যজ আদিবাসীদের বয়ান

অনুরাধা দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ভারত*
E mail: chakzanu@gmail.com

Received: 10.09.2024; Accepted: 29.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

The short story is one of the notable fruits of Bengali literature in the nineteenth century. Through these stories, writers depict broader aspects of social life within a limited framework. Among the prominent storytellers of the twentieth century is Mahasweta Devi. In addition to being a writer, she was a social worker who traveled to various places, observing people's lives from many perspectives, and wrote her stories based on those observations.

For centuries, Indian society has marginalized tribal communities such as the Sabar, Dom, Munda, and Bagdi, keeping them far from their basic rights and the main currents of life. The pain and suffering of these marginalized, impoverished people deeply troubled Mahasweta Devi, and she brought their real stories to life through her writing. Her work highlights the "voiceless section of Indian society," focusing on the marginalized who are perpetually exploited, striving to claim their rightful place and sustain their existence.

Moreover, she illustrated the protests of these tribes against societal injustices. Through these acts of resistance, she depicted their journey toward a new civilization and a transformed society. Unlike Rabindranath, whose definition of transcendence is moving from the finite to the infinite, her notion of upliftment is liberating the tribal and marginalized communities from their suffering.

She repeatedly emphasized that the relationship between the lower and upper classes can never be harmonious, as the upper class often prevents the lower class from advancing in life. Mahasweta Devi pointedly addressed this harsh reality of society. Through her stories, she presented the lives of the marginalized and lower classes in such a way that they became documents of their history. She became a "friend of the marginalized," wishing for them not to remain eternally downtrodden. She desired that these simple, innocent people reclaim what is rightfully theirs, achieving success both internally and externally, and that their lives be illuminated with hope.

বিশ্ব সাহিত্যের এক অনন্য শিল্পরূপ ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প পরবর্তী সময়ের ফসল। ছোটগল্প ক্ষুদ্র পরিসরে সমাজের বৃহত্তর একটি দিককে তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সংজ্ঞাতে ছোট প্রাণ ছোট কথা ছোট ছোট দুঃখ কথা বলে অভিহিত করলেও ছোটগল্প এখন আর ছোট প্রাণ ছোট কথা নয়। এই বিস্তৃত প্রবল ক্ষুদ্র পরিসরে বিধৃত এই শিল্প মাধ্যমটি কথনবিশ্বকে সন্ধান দেয় এক নতুন জগতের।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর যেমন জেলে বাগদী ডোম সাঁওতাল মুন্ডা শবর প্রভৃতি আদিবাসী জনজীবনের জীবন কথা চিত্রিত হতে শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকেরা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তার পরবর্তী সময়ে এই এই নিম্নবর্গীয় তথা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনগাঁথা সাহিত্যে চিত্রণের দায়িত্ব নেন মহাশ্বেতা দেবী, প্রফুল্ল রায়, দেবেশ রায়, ভগীরথ মিত্র প্রমুখ কথার সাহিত্যিকেরা। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনজীবনের উপস্থিতি প্রবলভাবে উঠে এসেছে। তিনি যে শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কথা তার সাহিত্যে তুলে ধরেছেন, যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেগুলো হল নিরন্ন অবহেলিত অন্ত্যজশ্রেণি নিম্ন বর্গীয় লোক। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন আদিবাসী লোকেদের সঙ্গে তাই সমাজে তাদের অবস্থান, তাদের জীবন প্রণালী প্রভৃতি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধি থেকেই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তার গল্পের চরিত্রগুলো। তার সেই গল্পগুলো শুধু তাদের গল্পই নয় সেগুলো হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের লোকেদের ইতিহাসের দলিল।

সাহিত্য সৃজনের পাশাপাশি মহাশ্বেতা দেবীর সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি তাদের জীবনকে দেখেছেন অনেক কাছে থেকে এবং তাদের চক্ষু দিয়ে তিনি জীবনকে অনুভব করেছিলেন সেই দেখা থেকেই তিনি লিখেছেন তাদের জীবনের দলিল। তার বোন সোমা মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি

> ‘‘ছেলেবেলা থেকেই সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেশার প্রবণতা ছিল মহাশ্বেতার’’[১]

কথায় আছে the morning shows the day. যেমন দিনে সূচনাতেই আমরা অনুমান করতে পারি সমস্ত দিন কেমন যাবে ঠিক একইভাবে মহাশ্বেতার বাল্যকাল ও কৈশোর কালে উঁকি দিলে আমরা তার পরবর্তী জীবনের গতিপ্রকৃতির অনেকটা আভাস পেয়ে যাই।

ভারতবর্ষীয় সমাজ যুগ যুগ ধরে দেশের সবর সাঁওতাল ডোম মুন্ডা ওরাও প্রভৃতি আদিবাসী জনজীবনকে মানুষের ন্যূনতম অধিকার থেকে দূরে রেখে জীবনের মূল স্রোত থেকেও অনেকটা দূরে অবস্থান করিয়ে রেখেছে। এই প্রান্তিকায়িত, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের যন্ত্রণা, দুঃখ দুর্দশা মহাশ্বেতা দেবীকে দিনরাত দগ্ধ করেছিল। এবং সেই কথাগুলোই কলমের আঁচরে তিনি তার গল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর কাজের মতো তার লিখার পটভূমি ও সুদূর বিস্তৃত। তার লেখা শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলার মানচিত্রে নয় তা ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর প্রদেশ বিহার ঝাড়খন্ড ও মধ্যপ্রদেশ প্রমুখ স্থানে। কর্মজীবনের চিত্রই তার সাহিত্যে ফুটে ওঠে তার কাছে সাহিত্য ও কর্মজীবন আলাদা দুটি বিষয় নয় তিনি এই দুটি বিষয়কে দেখেছেন অভেদ রূপে। সেই কারণেই তার কাজের ব্যাপ্তি বিশাল। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্ল রায়ের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যায় তিনি মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে বলেছেন-

> ‘‘তাঁর সাহিত্যিক জীবন ও ব্যক্তি জীবন আলাদা কিছু নয়। একটি আরেকটির পরিপূরক। যাঁরা তথাকথিত বাঙালি নন, বাঙালি সমাজের মূল স্রোতের বাইরে প্রান্তবাসি বহু মানুষের জীবন

সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। যে সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষকে নিয়ে লিখেছেন ব্যক্তি জীবনেও তিনি তাদের সুখ দুঃখের শরিক, তাদের মাতৃস্বরূপা এবং বিরাট আশ্রয়স্থল।''[২]

ব্রিটিশ আইন criminal tribes act 1871 অনুযায়ী ভারতের ২০২ টি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের লোধা শবর ঢোকারো প্রভৃতি জাতি লোককে অপরাধ প্রবণ বলে ঘোষিত করা হয়। যদিও পরবর্তীকাল ১৯৫২ সালে এদের বিমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয় তবুও আজও সমাজের চোখে এরা অপরাধী, নির্যাতিত নিহত উপেক্ষিত হয়। মহাশ্বেতা দেবী তার গল্পে বলা যায় তার সকল রকম রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি চরম বিরোধিতা করেছেন কারণ তিনি তাদের দেখেছেন অনেক কাছে থেকে। তিনি বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে পাঠককে এই বার্তায় দিতে চান যে এইসব জাতি অরণ্যের মতোই নিষ্পাপ ও সরল বরং তাদের সরলতা ও দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে সমাজে যারা নিরপরাধ শ্রেণী বলে কথিত তারাই তাদের সেই সব অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করে। মহাশ্বেতা দেবীর 'রাখদার' গল্পে এমনই এক সামাজিক চিত্রের পরিচয় পাই। তিনি আলোচ্য গল্পে প্রকৃতপক্ষে অপরাধী কারা সেই সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরেছেন তিনি বলেছেন-

> ''শবর জাত টার হাত থেকে ভাং আর ধনুক কেড়ে নিলে পুলিশে আর জোতদারে, মাগভাতারে ওদের মুছে ফেলে দেবে। কয়েকটা কেতুর দরকার এখনো আছে। থাকবেও। 'শবর' নামের ভয়ে ভীতিটা থাকুক। জেলার বন্ধাতিটা দেখছি তো আজীবন। ওদের নিয়ে মার করায় কারা? আমরা। আর চুরি ডাকাতি ওরা একা করে জেলায়? মহীবারণ অনন্তরাম এদের মতো বাঁধ চুরি করতে শবর জানে না। ধরা করাবার কালে দাও শবরকে জেলে ভরে''[৩]

শবরের মত জাতিরা কখনোই চুরি করে না বরং তারা চুরি করতে জানে না, বরং তাদেরকে যারা চোর বলে চিহ্নিত করে তারাই প্রকৃতপক্ষে অপরাধী। এইসব তথাকথিত সভ্য জাতিরা নিজেদের কাজ হাসিল করার জন্য অহরহ ভাবে ব্যবহার করে থাকে এই অন্ত্যজ শ্রেণীকে। অপরাধ প্রবণ কলঙ্ক নিয়ে এই সমাজের বুকে বেঁচে থাকে শবর জাতি।

মহাশ্বেতা দেবী দরিদ্রতম গ্রাম জীবন কে প্রত্যক্ষ করে দেখে বুঝছেন এই জীবন বড় কঠিন এবং ক্ষমাহীন। তাঁর অনেক গল্পেরই বাস্তব পটভূমি রয়েছে। তিনি নিজেই এব্যাপারে বলেছেন-

> ''কোনো জিনিস কাছ থেকে না দেখে, সেই বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা না করে আমি লিখি না''[৪]

নিম্নবর্গের লোকেদের প্রত্যহের চিন্তা ভাতের যোগান করা। আর এই ভাতের খিদের থিম টি বার বার উঠে আসতে দেখি মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে।

''সাঁঝ সকালের মা'' সাধন কোন্দরি এক নির্বোধ যুবক। জন্মের পর থেকেই অত্যন্ত অভাবের মধ্যে বেড়ে ওঠার দরুন সে কখনই পেট পুড়ে খেতে পাইনি, তার পেটের খিদের আগুন আর নেভে না। অপর দিকে তার মা জটি ছেলের জন্য অন্য যোগানোর জন্য ঠাকুরাণীর ভেক ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকে। সে লোকেদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিত না শুধু চেয়ে নিত এক মুষ্টি চাল। দিনের বেলায় যে ঠাকুরানী হয়ে ঘুরে সে রাতের বেলা ঘরে ফিরে হয়ে ওঠে মা। সে ঠাকুরানী হয়ে যে চাল পেতো তা দিয়ে ছেলের খিদে নিবারণ করত, নিজে থাকতো অভুক্ত। দীর্ঘদিন এভাবে না খাওয়ার ফলে একসময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসপাতালে ভর্তি করলে তিনদিন পর ডাক্তার জটির রোগ ধরতে পারে, সে রোগের নাম অনাহার। না খেতে খেতে জটির নাড়ি শুকিয়ে গিয়েছিল। এর ফলে জটির মৃত্যু ঘটে। মায়ের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধের জন্য সাধন পুরোহিত কে চাল দিয়েছিল এবং শ্রাদ্ধ শেষে সে আবার পুরোহিত কে গাল দিয়ে সেই চালটি ফেরত নিয়ে নেয়। তখন সে কোন শাস্ত্র বাক্য কানে নেয় না। কারণ তার কাছে ভাতের গন্ধ অনেক ভালো গন্ধ সে এই গন্ধের মধ্যে তার মাকে খুঁজে পায়।

ঠিক একই ভাবে একটি অভিজাত সম্পন্ন সংসার অপরদিকে একটি চির নিরন্ন মানুষের অবুঝ সংঘাতে গল্প 'ভাত'। পরিবারের কর্তা মৃত্যুশয্যায়। একদিকে চিকিৎসা অপরদিকে তান্ত্রিকের হোম এই দুটি চলছে সমান্তরাল ভাবে। বড় সংসার অনেক বেশি কাজ। তাই এ বাড়ির পরিচারিকা বাসিনী তারই গ্রামের একটি লোককে সাহায্যকারী হিসেবে এই বাড়িতে নিয়ে আসে। সেই লোকটি একটু ভাতের আশায় কাজ করতে আসে। কিন্তু বাড়িতে তান্ত্রিকের বিধান যতক্ষণ যজ্ঞ চলবে ততক্ষণ কিছু খাওয়া চলবে না অন্যদিকে উৎসব কাজের শেষে অপেক্ষা করে আছে অল্প ভাত খাবে বলে। সে গন্ধ পাচ্ছে নানা রকম খাবার, সে গল্প শুনে বাসিনির মুখে অষ্টবিজনের। এসব শুনে সে কোনভাবে ভাতের লোভ আটকে রাখতে পারেনা। এদিকে পুজো শেষ হওয়ার ঠিক পরমুহূর্তেই কর্তার মৃত্যু হয়। তখন তান্ত্রিক নতুন বিধান জারি করেন যে অশৌচের বাড়িতে যা কিছু রান্না করা আছে সেই সমস্ত ফেলে দিতে হবে। স্বল্প বুদ্ধি উৎসব যখন একথা শুনতে পারে তখন সে হিংস্র হয়ে ওঠে। সে কোনোভাবেই এ ব্যাপারটিকে মেনে নিতে পারে না তাই সে মোটা চালের বড় ডেগটি নিয়ে ছুটে চলে যায় সকলে নাগালের বাইরে। সে যেন ভাত মুখে দিয়ে স্বর্গ সুখ পায়। সে হাড়িটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে।

এভাবে ই ভাতের খিদে এই বিষয়টি নিয়ে রচিত অপর একটি গল্প 'জাতুধান'। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র সাজুয়া ভিওর। সেও সাধনের মত এক বিশাল দেহ ও নিরন্ন ব্যক্তি। রাক্ষসের মত খায় বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল জাতুধান অর্থাৎ রাক্ষস। গল্পে মূল থিমটি ফুটে ওঠে যখন আমরা দেখি বানের জলে সাজুয়া ভেসে যায় এবং মারা গেছে ভেবে তার পরিবারের লোক তার কুসপত্তলিকা দাহ করে। জ্ঞাত ভোজনের চাল দেয় মহাজন রামসিভ। এই শ্রাদ্ধের দিন ই গভীর রাতে ফিরে আসে জীবিত সাজুয়া। গোষ্ঠী প্রধান মাতং যখন বলে যে শ্রাদ্ধের চাল ফিরিয়ে দিতে হবে তখন সাজুয়া তার বিরোধিতা করে বলে সে চালের বস্তা নিয়ে চলে যাবে অনেক দূর। তার কাছে জীবিত এবং মৃতের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পেটে ভাত থাকা। মাতং যখন বলে এভাবে করলে দেবতার অভিশাপ লাগবে তখন উত্তরে সাজুয়া বলে পেটে ভাত থাকলে সকল দেবতার অভিশাপ বৃথা যায়।

আলোচ্য আলোচনা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে ভাতের খিদে কতটুকু প্রবল হলে উৎসব, সাজুয়া, সাধনের মতো লোকেরা এমন কাজ করতে পারে। তাদের কাছে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি কোন মাইনে রাখেনা। তাদের জীবনের হয়তো একটি চাওয়া পেট পুরে খাওয়া। আজন্ম নিরন্ন অবস্থায় থেকে যখন সে অল্প খাওয়ার সন্ধান পায় এবং সেই সন্ধান থেকে যখন নিজেকে বঞ্চিত হতে দেখে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে হিংস্র হয়ে ওঠে। আভিজাত্য শ্রেণীর জাতির দাম্ভিকতা দেখানোর অন্তরালে এভাবে না খেয়ে বেঁচে থাকে নিম্নবর্গের লোকগুলো। রীতিনীতির অন্ধকারে এভাবেই পিষ্ট হয়ে থাকে এই চরিত্রগুলো। মহাশ্বেতা দেবী শুধুমাত্র নিম্নবর্গীয় জীবনের বঞ্চনার চিত্র তার গল্পে তুলে ধরেননি একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাদের জাগরণ। তার গল্প 'বসই টুডু' তে দেখি বসাইকে জেগে উঠতে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে নিজে জেগে ওঠে সঙ্ঘবদ্ধ করে গ্রামের ক্ষেতমজুরদের এবং সংঘর্ষ করে হাসিল করেনি নিজে প্রাপ্যটুকু। 'বিছন' গল্পে দেখি মালিক লছমন সিংয়ের অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজের জীবন পণ করে বসে কুরনম, আসরফি, বুলকি একের পর এক অনেকেই। জোতদার লছমন সিং অনায়াসে তাদের গুপ্তহত্যা করে এবং দুলন-গজুর সাহায্যে দুলনেরই জমিতে লাশগুলো পুঁতে দেয়। এ পর্যন্ত দুলন নিজের পরিবারের কথা ভেবে লছমন সিংহের অন্যায় অবিচারের কথা লুকিয়ে রাখে কিন্তু যখন লছমন সিং দুলনেরই পুত্র ধাতুয়াকে হত্যা করে তখন সে হয়ে ওঠে প্রতিবাদী চরিত্র। তখন সে চুক্তি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করে মালিকের বিরুদ্ধে।

কঠিন আর্থসামাজিক পটভূমিতে বেঁচে থাকার লড়াই মহাশ্বেতা দেবী তুলে ধরেছেন তার অপর একটি গল্প 'রুদালী' তে। আলোচ্য গল্পে টাহার গ্রামের বাসিন্দা শনিচরী। সে জাতিতে গঙ্গু। গ্রামের সকলের মত সেও অসুমার দরিদ্রে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছে। পরপর কয়েক বছরেই মারা যায় তার পরিবারের সকল শাশুড়ি ভাসুর যা স্বামী এবং একমাত্র ছেলে বধুয়া। পুত্রের মৃত্যুর পর পালিয়ে যায় পুত্রবধূ। এত মৃত্যুর পরেও সে কাঁদে নি কারণ পেটের খিদে নামক বস্তুকে বাঁচানোর তাগিতে সে কেঁদে উঠার অবসরটুকু পায়নি। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস তাকে প্রচুর কাঁদতে হয় সেই পেটের খিদে নিবারণের জন্য। কারণ পেটের খিদে নিবারনের জন্য সে বেছে নেয় রুদালী পেশাকে। সে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে টাকার বিনিময়ে কান্না করে। লোকপ্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির জন্য কেউ না কাঁদলে তার আত্মার সদগতি হয় না। এছাড়াও শেষকৃত্যে যে যত বেশি রুদালী আনতে পারে তার ওপর নির্ভর করে সমাজে তার মান টুকু। এই হৃদয়হীন বন্দোবস্তে কারো ভালো হোক বা না হোক শনিচরীদের মতো নিরন্ন লোকদের বেশ ভালই হয়েছে। তারা খুঁজে পেয়েছে বাঁচার সুযোগ। তাদের মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী বোঝাতে চেয়েছেন যে ''পেটের চেয়ে বড় ভগবান নেই, পেটের জন্য সব কাজই করা যায়।''[৫]

মহাশ্বেতা দেবী শুধুমাত্র নিম্নবিত্তের দুঃখ দুর্দশার ছবি তুলে ধরেননি, একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে থাকা প্রতিবাদী ভাবনা এবং তাদের উত্তরণের উপায়। তার গল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিবাদীমুখী গল্প 'দ্রৌপদী'। দ্রৌপদী এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা সাঁওতাল উপজাতির প্রতিনিধি। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয় আলোচ্য দ্রৌপদী গল্পটি। আদিবাসী জন জীবনের নানা বঞ্চনা, প্রতারণা, সংস্কারের এক গৌরবময় দিক নিয়ে রচিত হয় অন্যতম শক্তিশালী গল্প দ্রৌপদী। গল্পের শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি সূর্য শাহু ও তার ছেলেকে খুন করার অপরাধে সমস্ত পুলিশ বিভাগ এবং এদের প্রধান অর্জন সিং দ্রৌপদী এবং তার স্বামী দুলনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশের কাছে তারা মোস্ট ওয়ান্টেড। ১৯৭১ এর বাকুলি অপারেশনে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে দুলন এবং দ্রৌপদী পালিয়ে যায় যার কারণে তারা আরো কুখ্যাত অপরাধি হয়ে দাঁড়ায় পুলিশের কাছে, যদিও পরবর্তীতে স্বজাতীয় সহকারীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দুলনের মৃত্যু ঘটে কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্রৌপদী ধরা দেয়নি, স্বামীর মৃত্যু তাতে বিচলিত করেনি বরং করে তুলেছে আরো প্রতিবাদী, সে একাই তার প্রতিবাদ করে গেছে, কিন্তু পুনরায় স্বজাতীয় সোমাই ও বুধনাই এর বিশ্বাসঘাতকতায় দ্রৌপদীও বেশিদিন আত্মগোপন করতে পারেনি। তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয় পুলিশের কাছে। তারপর সেনানায়কের আদেশ অনুযায়ী তার ওপর শুরু হয় অমানবিক নির্যাতন ও ধর্ষণ-

> ''তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ্য আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনও ওর দু'হাত দু'খুঁটোয় এবং দু'পা দু'খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কি যেন।ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে 'জল' বলে ওঠে, সেই ভয়ে ও দাঁতের নীচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?''[৬]

এই গল্পে দ্রৌপদী জোতদার মহাজন শোষক সমাজের বিরুদ্ধে লড়াইকারী এক পার্থিব সত্তা। এত অমানবিক কুকর্মের পরেও দ্রৌপদীর প্রতিবাদীস্বর দমন করে রাখা যায় না। উলঙ্গ ধর্ষিত দ্রৌপদী আরো প্রতিবাদী ও বীভৎস হয়ে ওঠে শোষক দলের সামনে। তাতে রীতিমত ভয়ে ত্রস্ত হন সেনানায়ক-

> ''দ্রৌপদীর কালো শরীর আরও কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত

হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?... দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।''[৭]

আইভি রহমানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দম্পতি 'দ্রৌপদী' গল্প প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী উল্লেখ করেছেন-

''দ্রৌপদী গল্প বিশেষ একটা আন্দোলনের কথা নিয়ে লিখেছি। সত্তরের দশকে বিশেষ একটা জায়গায় আদিবাসীদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাদের জায়গা জমি সব চলে যাচ্ছিল, সমস্ত জিনিসটাই একটা প্রতিবাদ মূলক পটভূমি তৈরি করেছিল, দম্পতি যখন উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে তখন কিন্তু চরম একটা চপেটাঘাত সমাজের মুখেই পড়ে তাই না? গল্পের শেষে সেনানায়ক কিন্তু একেবারেই পরাজিত। তারা শুধু একটা মেয়েকে উলঙ্গ করতে পারে, লালসার চরিতার্থ করতে পারে কিন্তু সম্মান দিতে পারে না। কিন্তু দেখো এই ঘটনার পর সমাজের মানুষ কিন্তু দ্রৌপদীকেই সম্মান করে তাইনা? এই সম্মান দ্রৌপদী আদায় করে নিয়েছে। আমি চাই সমাজের দ্রৌপদীরা সবাই এইভাবেই জেগে উঠুক। কেড়ে নিক তাদের প্রাপ্য। পরাজিত হয়ে যাক ওইসব সেনানায়ক সব সমাজেই।''[৮]

মহাশ্বেতা দেবীর এই প্রতিবাদী দ্রৌপদী চরিত্রটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্ট নারী।

নিম্নবর্গ শ্রেণীর সমাজে অবস্থান, নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের পাশাপাশি মহাশ্বেতা দেবী তার গল্পে দেখিয়েছেন তাদের উত্তরণ। তাঁর উত্তরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সীমা থেকে অসীমের পথে যাত্রা নয় তাঁর উত্তরণ সেই অর্থনৈতিক সামাজিক পটভূমিতে পিছিয়ে পড়া শোষিত বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষদের দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ করে দেওয়া। সেই উত্তরণের প্রেক্ষিতে রচিত একটি গল্প 'বান'।সন্ন্যাস নেওয়ার পর চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমের বন্যায় সকল জাতিগত বৈষম্য ভেদাভেদ তুচ্ছ করে সবাইকে যে একত্রিত করতে চেয়েছেন এই বিষয়টি উদ্ধৃত গল্পে গল্পকার তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেই চিরাচরিত ভেদাভেদ মুছে ফেলা হয়তো মহাপ্রভুর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। কারণ শোষক দল কখনো ও এই ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তাঁরা উঁচুতলার লোক, তারা রীতিনীতি নিয়মকানুন তৈরি ও পরিচালনা করবে এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক তাদের তৈরি করা সেই নিয়মগুলো মেনে চলবে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করা চলেনা। কিন্তু গল্পে দেখি মহাপ্রভুর আগমনে আচার্য বাড়ির লোক কথা দিয়েছে ওই নিম্নবর্গের সবাই আচার্য বাড়ির উঠোন অব্দি যেতে পারবে। যারা কখনো আচার্যবাড়ির সীমানা লঙ্ঘন করতে পারেনি তাদেরকে মহাপ্রভুর আগমনের ফলে উঠোনে উঠে মহাপ্রভু দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এ খবর পেয়ে বাগদির ছেলে চিনিবাস আশা নিয়ে বসেছিল যে মহাপ্রভু আসবে এবং সে আচার্য বাড়ির উঠোনে বসে পেট পুরে খেতে পাবে। কিন্তু গল্পের শেষে আমরা দেখি যে তার আশা অপূর্ণই থেকে যায়। চৈতন্যদেব ও আসেননি এবং আসেনি তার প্রেমের বাণ যে বাণী মুছে যাওয়ার কথা ছিল ধনী-দরিদ্রের,উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের। তাঁর না আসাতে গ্রামের সবাইকে বিতাড়িত করে দেওয়া হল শুধু মুড়ি ও বাতাস। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার যে চিরায়ত ভাবনা শোষক শ্রেণীর মজ্জায় প্রতিষ্ঠিত তারই প্রমাণ পাই-

''মাহিন্দাররা মিষ্টি গলায় বলল 'তিনি যদি আসত, তবে তোমরা উঠোনে উঠতে বাপ সকল, আমরা ডেকে এনে বসাতাম। তা, তিনি তো আসেনি, এখন আর উঠোনে উঠে জল কাদা করে কি হবে বল?''[৯]

উপরোক্ত বান গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ সমান করে দেওয়া। নিম্নবর্গের লোকদেরও তাদের ন্যূনতম অধিকারটুকু করে দেওয়া যারা তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। তা থেকে সমাজকে মুক্তির দিকে উত্তরণের পথ যেন মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পের মধ্য দিয়ে বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

'ডাইনি' গল্পেও দেখি উত্তরণের বিশেষ একটি চিত্র। কুসংস্কারে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের দিকটি মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পে তুলে ধরেছেন। শিক্ষার দৈন্যতার ফলে ডাইনি প্রথা অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে। যদি কোন মানুষের উপর প্রেতাত্মা ভর করে তবে সে ডাইনি ভয় করে এবং তখন তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই একমাত্র অবলম্বন। এ কিভাবে গল্পেও দেখি হনুমান মিশ্রেরর ছেলে অসহায় বোবা সোমরিকে অন্তঃসত্ত্বা করি সেই সত্য থেকে পলায়ন করার জন্য বা সেই সত্যকে ঢেকে রাখার জন্য মেয়েটিকে ডাইনির অপবাদ দিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে আসে। শিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত আদিবাসী গ্রামের লোকও সেই প্রথাগত কুসংস্কার কে বিশ্বাস করে, সত্যকে অবিশ্বাস করে সোমরিকে জঙ্গল থেকে আর ফিরিয়ে আনেনা। কিন্তু পরবর্তীতে যখন গ্রামের লোক সত্য ঘটনা জানতে পারে তখন তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে তারা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কলুষিত জীবন প্রণালী থেকে সভ্য জীবনের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। তাই দেখি মহাশ্বেতা দেবী গল্পের শেষে বলেন-

''ওরা পেছনে চাইল না। এখনো অনেক পথ হাঁটতে হবে।''[১০]

এই পথই হল উত্তরণের পথ, এই পথ হাটা হল নব্য ও সভ্য সমাজের দিকে উত্তরণ।

'ডোম' নামক অন্ত্যজ শ্রেণি নিয়ে রচিত অপর একটি গল্প 'বাঁয়েন'। গল্পটিতে দেখা যায় কিভাবে সমাজের কুসংস্কারের বলি হয় চন্ডী নামের একটি মেয়ে। ডোম শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে একটি কুসংস্কার বা প্রথা চালু আছে যে কাউকে বায়েনে ধরলে তাকে মারতে নেই। বাঁয়েন মারলে তা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক, এমনকি তাদের মতে বাঁয়েনের ছায়াও মাড়াতে নেই। চন্ডী এক সংসারী মেয়ে ছিল স্বামী ছিল সংসার ছিল কিন্তু সমাজ তাকে অপবাদ দিয়ে করে তুলেছে বাঁয়েন। সমাজের অসাধ্য যে কিছুই নেই তা ই লেখিকা গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠক মহলে উপস্থাপন করেছেন। বাঁয়ের পূর্ববর্তী জীবনে চন্ডী তার পৈতৃক পেশা ভাগাড়ের কাজ না করার জন্য অগ্রাহ্য করলেও সমাজ নামক প্রতিষ্ঠান তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছে ঠিকই এবং পরবর্তীতে তাকে উপহারস্বরূপ দিয়েছে তিন অক্ষরের নাম 'বাঁয়েন'। ঘর সংসার পরিবার পরিজন থাকা সত্ত্বেও তাকে করে দিয়েছে পরবাসী। তাই নিজের জীবন দিয়েও তাকে প্রমাণ করতে হয়-

''আমি বাঁয়েন লই গো, মোর বুকে কচি ছেলা, মোর বুক দুধে ফেটে যায়।''[১১]

এ উক্তির মাধ্যমে চন্ডী প্রমাণ করতে চায় যে সে স্নেহময়ী রক্তমাংসের মানুষ সেও এক জননী। মহাশ্বেতা দেবী দেখাতে চেয়েছেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অস্তিত্বের বাঁধন অটুট রাখার জন্য প্রতিনিয়ত লড়ে যেতে হবে এই সামাজিক নির্মম পরিণতির সঙ্গে। সামান্য নুনের জন্য মানুষকে কিভাবে লড়াই করতে হয় তা লিখে দেখিয়েছেন তার অপর একটি গল্প 'নুন' এর মাধ্যমে। জীবন মরণের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করে নিতে হয় সামান্য নুন। গল্পের মহাজন উত্তমচাঁদ কয়েক পুরুষ ধরে কোয়েল নদীর গা ঘেঁষে থাকা আদিবাসীদের বেঠবেগাড়িতে বেঁধে রেখেছিল। চতুর্থ নির্বাচনের পর যখন উত্তমচাঁদ আর মুন্ডা দের খাটাতে পারেনা তখন উত্তমচাঁদ বলেছিল-

''হাতে নয়, রুটিতে নয়, নিমক সে মারেগা।''[১২]

এরপর সে বাজারে নুন বিক্রি করা বন্ধ করে দেয় তাই গ্রামবাসীদের কাছে সেই উত্তমচাঁদের শোষণের দিনগুলোকে সুখের মনে হয়। কারণ তখন তাদের সামান্য নুনের জন্য প্রাণের মূল্য দিতে হয়নি। সেই সময় আর যাই হোক নুন ছিল সস্তা এবং দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় এক উপাদান যা আজ তাদের কাছে মহামূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁচার তাগিদেই তারা নুন চুরি করে এবং এর হলে মূল্য দিতে হয় নিজের প্রাণের। কিন্তু এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা না উত্তমচাঁদ। আদিবাসীদের জীবনের সংগ্রাম যে কখনো উপরের তোলার লোক বুঝতে পারেনা এই কথাটি লেখিকা গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। 'মৌল অধিকার ও ভিখারী দুসাদ' ছোটগল্পে লেখাটা দেখিয়েছেন কিভাবে আদিবাসী জনজীবন তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং জীবন ধারণের জন্য তাদের একমাত্র অবলম্বন ভিক্ষাবৃত্তি। নওয়াগরের জমিদার রাজ সাহেবের পুলিশ ও সিপাহী মিলে দুসাদের বকরা বকরি কেড়ে নিয়ে যায় রাজ সাহেবের অতিথি অভ্যর্থনার জন্য। তখন দুসাদ বুঝতে পারে –

> ''ভিখারীর মৌল অধিকার যে বারবার ক্ষুন্ন হয়। রাজ সাহেবের ক্ষতিপূরণ মেলে। ভিখারীর মেলে না কেন?''[১৩]

সমাজের সকল নিয়ম কানুন সকল মৌলিক অধিকার উচ্চ শ্রেণীর মানুষের নির্দেশ অনুযায়ী যে চলে আসছে এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে শোষিত ও বঞ্চিত লেখা বারবার সমাজের সেই দিকটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। গল্পের শেষে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন-

> ''ভিখারী দুসাদ সাত নম্বর মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও, তিন নম্বর মৌল অধিকারের প্ররক্ষতা পেয়েছে। স্বাধীনতার অধিকার। ও যাতে জন্ম-জন্ম কাল ভিখ মাঙ্গাই থেকে যায়, ভারতের সংবিধান নিশ্চয় তা দেখবে।''[১৪]

এভাবেই সমাজের কাছে প্রহসনের কাছে মিথ্যা প্রতিকার না যে তারা জীবনধারণের জন্য বেছে নেই ভিক্ষার পথটিকেই।

কথাশেষ: অন্ত্যজ শ্রেণীর তথা প্রান্তজনের স্বপ্নের বুননকে মহাশ্বেতা দেবী অন্য এক মাত্রা দিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর পূর্বে অন্যান্য কথাসাহিত্যিকেরা যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেশ রায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখেরা নিম্নবিত্তের জীবনধারাকে লোকান্তর থেকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন ঠিক, কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর সেই প্রকাশের মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর কণ্ঠস্বরে একটা আলাদাই প্রতিফলন ছিল। তিনি তাদের সমাজের গভীরে প্রবেশ করে তাদের দৈনন্দিন জীবন আচরণকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে দর্শক মহলে তুলে ধরেছেন। এই প্রান্তজনের কথাকে তিনি যেভাবে সাহিত্যরূপ দিয়ে পাঠক মহলে তুলে ধরেছেন সেই কারণে তিনি আজ ও 'প্রান্তজনের সখা' হিসেবে পরিচিত। তিনি তাঁর প্রতিটি লেখায় নিম্নবর্গীয় তথা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি সরকার নামক যে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি উচ্চবর্ণের অত্যাচারী শোষক সকলকেই বিদ্রুপ মানে বৃদ্ধ করেছেন। তার লিখার মধ্যে রয়েছে যেমন বক্তব্য তেমনি রয়েছে বাস্তব জীবন্ত মানুষ। তিনি শুধু চান সেই সহজ সরল মানুষগুলো যেন সহজে বেঁচে থাকতে পারে। দুমুঠো ভাত খেয়ে, তাদের চির নিরন্ন হয়ে যেন থাকতে হয় না, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেন তাদের কোন বিদ্রোহ করতে হয় না। তিনি শুধু চান শুধু বাইরের বৈশিষ্ট্যই নয় অন্তর থেকেও অন্তর থেকেও তারা হয়ে উঠুক সত্যিকারে সফল মানুষ। আলোক রঞ্জিত হোক তাদের জীবন।

আকরগ্রন্থ:

১) দেবী মহাশ্বেতা, শ্রেষ্ঠ গল্প , প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

২) দেবী মহাশ্বেতা, 'গল্পসমগ্র' প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

সহায়ক গ্রন্থ:

১) মন্ডল উৎপল, কামনা মজুমদার, 'মহাশ্বেতার গল্প: মহাশ্বেতার সন্ধানে', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,কলকাতা ২০১২।

২) দত্ত শিপ্রা, 'মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জনজীবন' অক্ষর পাবলিকেশন্স, জগন্নাথ বাড়ি রোড আগরতলা ত্রিপুরা এবং ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা -১২

৩) চক্রবর্তী সুমিতা, 'ছোট গল্পের বিষয় আশয়' অনুপ কুমার মাহিন্দার, পুস্তক বিপনী ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

৪) মুখোপাধ্যায় অরুনকুমার, 'কালের পুত্তলিকা' সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩

৫) চৌধুরী শ্রী ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩

তথ্যসূত্র:

১। মন্ডল উৎপল, কামনা মজুমদার, 'মহাশ্বেতার গল্প: মহাশ্বেতার সন্ধানে', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,কলকাতা ২০১২। পৃ- প্রস্তাবনা ২

২। ধর তপন, (সম্পাদক), প্রসাদ, ৫০ বর্ষ, ২০১৬ সেপ্টেম্বর, পৃষ্ঠা ১১, মুদ্রিত।

৩। মহাশ্বেতা দেবীর ৫০ টি গল্প, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড 'রাখদার' পৃষ্ঠা ৬৪৮

৪।মন্ডল উৎপল, কামনা মজুমদার, 'মহাশ্বেতার গল্প: মহাশ্বেতার সন্ধানে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,কলকাতা ২০১২। পৃষ্ঠা ২৬

৫। তদেব পৃষ্ঠা ৪৯

৬। দেবী মহাশ্বেতা, শ্রেষ্ঠ গল্প , প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ পৃষ্ঠা -৬৯-৭০

৭। তদেব পৃষ্ঠা -৭১
৮। রহমান আইভি, মহাশ্বেতা দেবীর সাথে এক সন্ধ্যা, এই দেশ পত্রিকা,ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ার (বুধবার)২০১৪, মুদ্রিত
৯।মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ পৃষ্ঠা -৩১
১০। দেবী মহাশ্বেতা, 'গল্পসমগ্র' প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ পৃষ্ঠা- ৩৫৫
১১। তদেব পৃষ্ঠা- ৪২
১২। তদেব পৃষ্ঠা- ১১৩
১৩। তদেব পৃষ্ঠা- ১৪৩
১৪। তদেব পৃষ্ঠা- ১৪৫